প্রাণায়াম বিধি

মহাত্মা নারায়ণ স্বামী

আর্য্য সমাজ কলিকাতা
১৯ বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

প্রাণায়াম বিধি

মহাত্মা নারায়ণ স্বামী
প্রণীত

অনুবাদক
আচার্য্য প্রিয়দর্শন

প্রকাশক ঃ
মন্ত্রী
রাজেন্দ্র প্রসাদ জয়সওয়াল
আর্য্যসমাজ কলিকাতা
১৯ বিধান সরণী
কোলকাতা-৭০০ ০০৬

অনুবাদক ঃ
আচার্য্য প্রিয়দর্শন
সম্পাদক— পণ্ডিত নচিকেতা ভট্টাচার্য্য

তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৪০১
চতুর্থ সংস্করণ ঃ ১৪০৯

লেজার কম্পোজ ঃ
সাধনা প্রেস
৪৫/১ এফ, বিডন ষ্ট্রিট
কোলকাতা-৭০০ ০০৬

মুদ্রক ঃ
কমলা প্রেস
২০৯ এ, বিধান সরণী
ক লকাতা-৭০০ ০০৬

মূল্য ঃ ৬.০০ টাকা

মুক্তির উত্তম সাধন উপাসনা

"যুঞ্জন্তি ব্রঘ্নমরুষং চরন্তং পরিতস্থূষঃ।
রোচন্তে রোচনা দিবি।"

ঋগ্বেদ ১।১।১১।১॥

বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাবতীয় পদার্থ সিদ্ধির মুখ্য হেতু যে প্রাণ ; সেই প্রাণকে প্রাণায়াম রীতি অনুসারে অত্যন্ত প্রীতির সহিত পরমেশ্বরে যুক্ত করেন। এ কারণ তাঁহারা মোক্ষ লাভ করিয়া সদা আনন্দে থাকেন।

স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী

পরিচিতি

"অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতি রুদ্ধা প্রাণাযামপরাযণাঃ।"

গীতা ৪।২৯॥

"অপর যোগিগণ প্রাণ ও অপানের গতিকে রুদ্ধ করিয়া, প্রাণায়াম পরায়ণ হন, আবার অপানে প্রাণের হবন করিয়া থাকেন। এইভাবে প্রাণে-অপানের হবন করিয়া অর্থাৎ রেচক, পুরক ও কুম্ভক এই অবয়বত্রয়ে বিভক্ত প্রাণায়ামের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।"

যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ গীতায় কেবল মাত্র অষ্টাঙ্গ যোগের অন্তর্গত যেরূপ আসনের উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রূপ প্রাণায়াম বিষয়ে ও কুশল যোগীর যোগাভ্যাস জন্য স্বীয় অনুভব ও বর্ণনা করিয়াছেন।

'প্রাণায়াম বিধি' পুস্তিকায়, মহাত্মা নারায়ণ স্বামীজী মহারাজ ও তাঁহার যোগাভ্যাসের জন্য অনুভব মানব হিতার্থে যাহা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাই প্রকাশিত হইল।

আচার্য্য প্রিয়দর্শন

ওম্

প্রাণায়াম বিধি

প্রথম অধ্যায়

অষ্টাঙ্গ যোগের যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান, সমাধি[১] এই আটটি অঙ্গের প্রথম পাঁচটি যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার সম্প্রজ্ঞাত সমাধির সাধন অর্থাৎ বহিরঙ্গ সাধনা এবং শেষের তিনটি ধারণা, ধ্যান ও সমাধি অন্তরঙ্গ সাধন নামে প্রসিদ্ধ।

এই অন্তরঙ্গ সাধন, সম্প্রজ্ঞাত সাধনের অসাক্ষাৎ সাধন[২]। প্রথমের পাঁচটিকে **বহিরঙ্গ** এবং শেষের তিনটিকে **অন্তরঙ্গ** সাধন কেন বলা হয়—ইহার কারণ এই যে, বহিরঙ্গ সাধন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার উন্নতি লাভ হয়। ইহাও সত্য যে, অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা কেবল মানসিক ও আত্মিক উন্নতি হয়। কিন্তু[৩] অন্তরঙ্গ সাধন দ্বারা যে আত্মিক উন্নতি হয় উহা অতি উচ্চস্তরের সাধনা এবং উহাই এক প্রকারের অসম্প্রজ্ঞাত (নির্বীজ) **সমাধির সাধনা**; যদি সাক্ষাৎ না হয় তো—অসাক্ষাৎ তো বটেই।

এই ছোট্ট একটি পুস্তিকায় যোগের অন্তরঙ্গ সাধন সমূহের আলোচনা করা হইবেনা। সে কারণ, বহিরঙ্গ সাধন সমূহের আলোচনা ইহার দ্বারা করা হইবে। কিন্তু কেবল ইহার চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম সম্বন্ধে ততটুকুই আলোচনা করা ইহবে, যতটুকুতে যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মধ্যেও অভিরুচি সৃষ্টি হয়, এবং তাহারা প্রারম্ভিক সাধন (প্রাণায়াম) আরম্ভ করিতে সক্ষম হয়।

১। যোগ দর্শন সূত্র ৩—৭ ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য।

২। যোগ দর্শন সূত্র ৩—৮।

৩। অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ সাধনের পার্থক্য দেখান হইয়াছে, কেবল মাত্র উভয় প্রকার সাধনের প্রকার ভেদ প্রদর্শন করাইবার জন্য। ইহা দ্বারা কোনও সাধনের অসম্মান বা ছোট বড় দেখান, এ ভাব লইয়া বলা হয় নাই। যোগের আটটি অঙ্গ আপন আপন স্থানে আপন আপন প্রয়োজন পূর্ণ করে।

ইহা পরিতাপের বিষয় যে, ভারতবাসী আর্য্যজাতির সুসন্তান, আর্য্যজাতির বংশধর আপন পূর্ব পুরুষদের অর্জিত বিদ্যা যোগ সম্বন্ধে বড়ই উদাসীন ও অনভিজ্ঞ। বাস্তবিক পক্ষে প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানই (Eastern Psychology) যোগ যোগদর্শনের সূত্র এবং ব্যাসমুনি কৃত যোগ সূত্রের ভাষ্য হইতে শরীরের অন্তরঙ্গ অপেক্ষা অন্তরঙ্গের (অন্তঃকরণের) জ্ঞানলাভ করা যায়। এবং কি উপায়ে উহার উন্নতি সাধন করা যাইতে পারে ইহারও জ্ঞানলাভ করা সম্ভব।

পাশ্চাত্য মনীষিগণকে (Western Psychology) যেখানে 'চিৎ' (Mind) (Brain) অন্তঃকরণ বা মস্তিষ্ক বলে, সেখানে পাশ্চাত্য মনোবৈজ্ঞানিক তাহার সামাধান করিতে অক্ষম।

তাঁহারা উহাকে অলৌকিক বলিয়া (mystery)। উড়াইয়া দেয়। কিন্তু প্রাচ্য মনোবিজ্ঞানে (যোগ) এ প্রশ্ন ওঠে না। উহাতে স্পষ্টরূপে প্রত্যেক সূক্ষ্ম অন্তঃকরণের কথা বলা হইয়াছে এবং অভ্যাসের অন্তর্গত এত সাধন রাখিয়াছে যাহাতে অতি আয়াসেই আত্মজগতে প্রবেশ করিয়া জীবনের শেষ উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি দিতে পারে। যাহাই হউক, এ বিষয়ে অধিক আলোচনা না করিয়া এবার পুস্তকের বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করা যাক্।

ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, যোগের প্রারম্ভিক অঙ্গ দ্বারা মানসিক উন্নতির অতিরিক্ত শারীরিক উন্নতিও হয়। সর্বপ্রথম ইহার প্রতিই দৃষ্টি দেওয়া যাক্ এই সাধন সমূহের মধ্যে প্রথমে যম ও নিয়ম দ্বারা কিভাবে শারীরিক উন্নতি হয় সেই বিষয়ই আলোচনা হইতেছে।

যম নিয়ম ও শারীরিক উন্নতি

যম পাঁচ প্রকার—১ অহিংসা, ২ সত্য, ৩ অস্তের, ৪ ব্রহ্মচর্য, ৫ অপরিগ্রহ,
(অস্তেয়=চৌর্যত্যাগ), (অপরিগ্রহ=লোভী না হওয়া)

নিয়ম পাঁচ প্রকার—১ শৌচ, ২ সন্তোষ, ৩ তপ, ৪ স্বাধ্যায়, ৫ ঈশ্বর প্রণিধান।
(ঈশ্বর প্রণিধাম=ঈশ্বর ভক্তি)

১। উদ্যম—পুরুষার্থ বিষয়ে সন্তোষ ভাব—আলস্য। উদ্যম অর্থাৎ পুরুষার্থ দ্বারা যে ফল লাভ হয় তাহাতে সন্তুষ্ট হওয়াই—সন্তোষ।

ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম 'অহিংসা'কেই ধরা যাক্ অহিংসা দ্বারা শারীরিক উন্নতি কিভাবে হইয়া থাকে প্রথমে তাহাই বলিতেছি।

অহিংসা ও শারীরিক উন্নতি

যে ব্যক্তি অহিংসা পালন করিবে তাহার পক্ষে অহিংসক হওয়া কর্ত্তব্য। হিংসা অবলম্বন করিলে মানুষের মধ্যে ঈর্ষ্যা, দ্বেষ, ক্রোধ, লোভ, মোহ আদি বৃত্তিসমূহ মাথা তুলিয়া ওঠে। এই সমস্ত বৃত্তির জাগৃতিতে সে যাহা কিছু ভোজন করিবে উহা পরিপাক হইবে না[১]।

ভুক্তবস্তু পরিপাক না হইলে অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য আদি রোগ সৃষ্টি হইবে। পরিণাম স্বরূপ—শারীরিক উন্নতি না হইয়া রোগী হইয়া পড়িবে। তাহা ছাড়া শরীর রোগগ্রস্ত হইয়া অবনত অবস্থা দেখা দিবে। সাধারণতঃ দেখা গিয়াছে যে, অহিংসা পালন দ্বারাই শারীরিক প্রয়োজনীয়তা ও শারীরিক উপকারিতা সিদ্ধ হইয়া থাকে। এই ভাবে অবশিষ্ট যম এবং নিয়মের বিষয় সম্বন্ধে বিচার করা যাইতে পারে। যাহা হউক ইহা সিদ্ধ হইল যে, নিয়মও শারীরিক উন্নতির হেতু বা কারণ।

আসন ও শারীরিক উন্নতি

যে ভাবে বসিলে স্থির সুখ হয় উহাই আসন।[২] স্থির সুখ লাভের জন্য শরীরকে নীরোগ রাখা প্রয়োজন। নীরোগ হইতে হইলে শীর্ষাসন, সিদ্ধাসন, পদ্মাসন,

---

১। ঈর্ষ্যাভযক্রোধ পরিপ্লবনলুব্ধেন রোগদৈন্যনিপীড়িতেন।
প্রদ্বেষযুক্তেন চ সেব্যমানমন্নং ন সম্যক্ পরিপাকমেতি।

(মাধব নিদান ৩—৮)

২। যোগদর্শন ২—৪৬।

ভদ্রাসন প্রভৃতি অভ্যাস করা হয়। এই সমস্ত আসন দ্বারা বহুবিধ ব্যাধি দূর হয়। শুধু তাহাই নহে, নানা প্রকার শারীরিক উন্নতি লাভও হইয়া থাকে।

আসন দ্বারা শারীরিক উন্নতি হইবার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ বলিয়া এ বিষয়ে অধিক লেখা প্রয়োজন বোধ করি না। এবার যোগেরে তিন অঙ্গ বিষয়ে বলিবার পর যোগের চতুর্থ অঙ্গ **'প্রাণায়াম'** বিষয়ে অভিপ্রায় ব্যক্ত করা উচিত বলিয়া, সেই বিষয়েই লেখা হইতেছে। প্রণায়াম সম্বন্ধে সর্বপ্রথম প্রকৃত বিষয়কেই লওয়া হউক যে, এই প্রাণায়াম দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন কিভাবে হইয়া থাকে।

প্রাণায়াম ও শারীরিক উন্নতি

প্রাণায়ামের অনুশীলন দ্বারা কিভাবে শারীরিক উন্নতি হয় এই বিষয়টি জানিতে হইলে প্রথমতঃ শরীরের অভ্যন্তরস্থিত কার্য্য সমূহের ক্রিয়মান অনিচ্ছিত কার্য্য সমূহ, আমাদের হৃদয় ও ফুসফুসের ক্রিয়ার উপর আলোকপাত করিতে হইবে।

হৃদয়ের স্থূল কার্য্য

এই শরীরে দুই প্রকারের অতি সূক্ষ্ম নালি আছে। একটি সমস্ত শরীর ঘুরিয়া হৃদয়ে আসে, আর অপরটি হৃদয় হইতে সমস্ত শরীরে যায়। প্রথমটির নাম **'শিরা'** এবং দ্বিতীয়টির নাম **'ধমনি'**

'শিরার' ক্রিয়া, সমস্ত শরীরের অশুদ্ধ রক্তকে পরিশুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে হৃদয়ে পৌছাইয়া দেওয়া, আর হৃদয় সেই অশুদ্ধ রক্তকে পরিশুদ্ধ করিয়া সেই পরিশুদ্ধ রক্তকে ধমনির সাহায্যে সমস্ত শরীরে আবার পৌছাইয়া দেওয়া।

রক্ত অশুদ্ধ হয় কেন? ইহার কারণ এই যে, পরিশুদ্ধ রক্ত শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন কর্মে প্রযুক্ত হয় এবং সেই প্রযুক্ত রক্ত আবার অশুদ্ধ হইয়া পড়ে। এই ভাবে হৃদয় হইতে পরিশুদ্ধ রক্ত, সমস্ত শরীরে এবং অপরিশুদ্ধ রক্ত

আবার পরিশুদ্ধ হইবার জন্য হৃদয়ের ফিরিয়া আসে। প্রতি মুহূর্তে এই ক্রিয়া চলিতেছে।

শুদ্ধ ও অশুদ্ধ রক্তের ভেদ

শুদ্ধ রক্ত সামান্য চক্‌চকে ভাবের হয় এবং বেশ গাঢ় লাল রঙের রূপে দেখা যায়। কিন্তু যখন রক্ত অশুদ্ধ হয়, তখন তাহাতে সামান্য মলিনতা আসে। শুদ্ধ রক্তে অক্সিজেন (Oxygen) প্রচুর মাত্রায় থাকে কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে প্রযুক্ত হইয়া যখন সেই রক্ত অশুদ্ধ হইয়া যায়, তখন তাহাতে অকসিজেনের মাত্রা নাম মাত্র থাকিয়া যায় এবং তৎস্থলে এক বিষাক্ত বায়ু (Corbonic Acid Gas) রক্তে সঞ্চারিত হয়। এই পরিবর্তন দ্বারাই রক্তে একটু মলিনতা আসে।

ফুসফুসের কাজ

শিরার সাহায্যে অশুদ্ধ রক্ত যখন হৃদয়ে পৌঁছায় সেই সময় হইতেই ফুসফুসে ক্রিয়া আরম্ভ হইতে থাকে। ফুসফুসকে দেখিতে অনেকটা স্পঞ্জের ন্যায়। স্পঞ্জে যেমন অসংখ্য প্রকোষ্ঠ (Cells) থাকে সেইরূপ ফুসফুসেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (Cells) থাকে।

বৈজ্ঞানিকেরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠগুলিকে সারি সারি লম্বা চওড়া ভাবে বিস্তৃত করিয়া রাখা যায়, তাহা হইলে তাহার বিস্তার ১৪ হাজার বর্গ ফিট্ হইবে। এই কর্ণগুলি একটি মাংস পেশী (Diaform)। ইহা মুক্ত এবং বন্ধ হইয়া যায়। যখন এই কণগুলি মুক্ত হয়, তখন একদিক হৃদয় হইতে অশুদ্ধ রক্ত এবং অন্যদিক হইতে শ্বাস দ্বারা গৃহীত শুদ্ধবায়ু উভয়ে মিলিত হইয়া তাহাকে পূর্ণ করিয়া দেয়। এইভাবে অশুদ্ধ রক্ত, শুদ্ধ বায়ুর সংস্পর্শে আসিয়া একাকার হইয়া যায়।

প্রকৃতির এক বিলক্ষণ নিয়ম (অশুদ্ধ রক্ত + শুদ্ধ বায়ু) অনুসারে ইহা নিরন্তর ক্রিয়াশীল। বিলক্ষণ নিয়মটি হইল—যাহার মধ্যে যে বস্তুটির অভাব সে উহাকে দূর হইতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। রক্তে শুদ্ধ বায়ু নাই (Oxyigen) এবং

শ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ুতে কার্বন নাই—এই দুইটির মধ্যে যখন উপর্য্যু
নিয়ম কর্ম করিতে থাকে তখন তাহার পরিণাম এইরূপ হয়—রক্ত হই
কার্বন বায়ু বাহির হইয়া শ্বাস বায়ুতে এবং প্রশ্বাস দ্বারা গৃহীত বায়ু হই
অক্সিজেন আসিয়া রক্তে মিশিয়া যায়। ইহার ফলে রক্ত শুদ্ধ হয় এবং শ্বা
দ্বারা আগত বায়ু অশুদ্ধ হইয়া যায়।

শুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে যাইয়া ধমনি সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হ
আর অশুদ্ধ বায়ু নিঃশ্বাসের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। এই ক্রিয়া প্রতিক্ষ
হইতে থাকে।

হৃদয়ের স্পন্দন

হৃদয়ে স্পন্দন হয় কেন? একবার হৃদয় হইতে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হইবার
জন্য ফুসফুসে যাওয়া, এবং ফুসফুস হইতে শুদ্ধ রক্ত হৃদয়ে ফিরিয়া আসা, এই
দুই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়ে স্পন্দন হয়। In avarage পুরুষ হৃদয়ে এক মিনিটে
৭২ বার স্পন্দন হইয়া থাকে। বিশেষ অবস্থায় বয়সের তারতম্য অনুসারে
স্পন্দনের মাত্রায় ন্যূনাধিক্য হইয়া থাকে। তবে, সাধারণতঃ এক সেকেণ্ডেরও
কম সময়ে একবার অশুদ্ধ রক্ত, শুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসে আসে এবং শুদ্ধ
হইয়া পুনরায় হৃদয়ে ফিরিয়া যায়। এক শরীর বৈজ্ঞানিক হিসাব করিয়া
দেখিয়াছেন যে, এইভাবে ২৪ ঘন্টায় ২৫২ মন রক্ত হৃদয় হইতে ফুসফুসে যায়
এবং এই পরিমাণ রক্ত শুদ্ধ হইয়া ফুসফুস হইতে হৃদয়ে ফিরিয়া আসে। এই
স্পন্দনের শব্দ হয় 'লবু-ডপ' উচ্চারণের মত। যখন হৃদয় সংকুচিত হইয়া
রক্ত বাহিরে আসে তখন শব্দ হয়—'লুব' ধ্বনির মত, আর যখন হৃদয়
বিস্তৃত হইয়া উহাতে রক্ত গৃহীত হয় তখন শব্দ 'ডপ্' ধ্বনির মত। এই উভয়
প্রকার ধ্বনির ব্যবধান অবশ্যই থাকে। পরন্তু সে সময়ের ব্যবধান এতই
অল্প যে, মনে হয় যেন শব্দ একই সময়ে ধ্বনিত হইতেছে। বিশেষ বস্তু
যন্ত্র ব্যতীত এই ব্যবধান বুঝিতে পারা যায় না। যাহা হউক এবার বিচারণীয়
এই যে—।

ফুসফুসে শুদ্ধ বায়ু প্রবেশ না করিবার পরিণাম

যদি হৃদয় হইতে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসে যায় কিন্তু শ্বাস দ্বারা প্রচুর পরিমাণে বায়ু ফুসফুসে না আসে, অথবা সমস্ত কোষ সমূহে যেখানে রক্ত পৌঁছিয়াছে সেখানে শুদ্ধ বায়ু না পৌঁছায়, তাহা হইলে তাহার পরিণাম কি হইবে?

ফুসফুসের প্রধানতঃ তিনটি ভাগ আছে।

(১) উপরিভাগ, যাহা প্রায় গলা পর্যন্ত বিস্তৃত।

(২) মধ্যভাগ, যাহা দুই দিকে হৃদয়ের এদিকে ওদিকে আছে।

(৩) নিম্নভাগ যাহা 'ডায়োফর্ম' মাংস পেশীর উপর দুই দিকে আছে। সাধারণ রীতি অনুসারে যে শ্বাস গ্রহণ করা হয় উহা পর্য্যাপ্ত হয় না, এই কারণ ফুসফুসের সমস্ত ভাগের অথবা সমস্ত অংশের কোষ সমূহে পৌঁছিতে পারে না। যখন ফুসফুসের উপরি অংশে শ্বাস দ্বারা বায়ু না পৌঁছায়, তখন ফুসফুসের উপরি অংশ রোগাক্রান্ত হইতে আরম্ভ করে এবং ঐ অংশে দোষ দেখা দেওয়ায় এক প্রকার রোগের সৃষ্টি হয়,—যাকে যক্ষ্মা বা Tuberculousis বলে। এই ভাবে ফুসফুসের নিম্ন ও মধ্য অংশটুকু যখন অকেজো ও দোষ পূর্ণ হইতে থাকে, তখন পরিণাম স্বরূপ কাশি, হাঁপানী দেখা দেয়। শুধু তাহাই নয়, নিমোনিয়া, জীর্ণজ্বর প্রভৃতি ফুসফুস সম্বন্ধীয় অনেক প্রকার রোগ সৃষ্টি হইতে থাকে।

এই ভাবে প্রচুর পরিমাণে বায়ু ফুসফুসে না পৌঁছাইবার দরুন, যেখানে একদিকে ফুসফুস সম্বন্ধিত রোগ উৎপন্ন হয় আর—

এক ভয়ঙ্কর পরিণাম

অপর দিকে ইহাও সৃষ্টি হয় যে, হৃদয় হইতে যে অশুদ্ধ রক্ত শুদ্ধ হইবার জন্য ফুসফুসে আসে উহা শুদ্ধ না হইয়া অশুদ্ধ অবস্থায় সেখান হইতে ধমনি সমূহ দ্বারা সমস্ত শরীরে পৌছিয়া যায়। ইহার পরিণাম রক্তবিকার। রক্তবিকৃত

হইলে সাধারণ রোগ—চুলকানি হইতে আরম্ভ করিয়া ভয়ঙ্কর কুষ্ঠ ব্যাধি পর্যন্ত হইয়া যায়।

অতএব এই সমস্ত দুষ্পরিণামের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য প্রয়োজন—বায়ুর দ্বারা ফুসফুসকে পূর্ণ রাখা এবং এরূপ কোনও কোষ থাকিবে না, যাহাতে বায়ু না পৌঁছিয়াছে। এখান হইতেই প্রাণায়ামের প্রয়োজনীয়তা আরম্ভ।

প্রাণায়ামের প্রয়োজন

প্রাণায়ামের সাহায্যে মানুষ যখন ভিতরের শ্বাসকে বাহিরে রুদ্ধ করিয়া দেয় তখন তাহার মধ্যে শ্বাস গ্রহণের প্রবল ইচ্ছা জন্মে। ইহার ফলে শ্বাস ভিতরে প্রবেশ করিবার সময় শ্বাস সবেগে প্রবল বায়ুর বন্যা অথবা ঝড়ের ন্যায় ফুসফুসে প্রবিষ্ট হয় এবং যেরূপ ঝড় বা প্রবল বায়ু নগরের কোনে কোনে প্রবেশ করে, সেইরূপ সবেগে শ্বাস দ্বারা ভিতরে গৃহীত বায়ু ফুসফুসের প্রতিটি কোনে প্রবেশ করে। সে কারণ রক্তে কোনও প্রকার দোষ, অথবা বিকার উৎপন্ন হইতে পারে না।

যাহা হউক দেখা গেল যে, প্রাণায়ামকে শুধু শারীরিক উন্নতির হেতু না বলিয়া মুখ্য হেতু বলাই ঠিক্। এই কারণ প্রাণায়াম করা আবশ্যক। ইহা স্পষ্ট যে, প্রাণায়াম যেখানে শারীরিক উন্নতির সাধন, সেখানে মানসিক উন্নতিরও মুখ্য সাধন। প্রাণায়াম কি, এবং কি ভাবে করা উচিত, এ বিষয় জানিবার ইচ্ছা উৎপন্ন হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু একথা বলিবার পূর্বে উহার কতিপয় সাধনের উল্লেখ করা প্রয়োজন। সেই সাধন সমূহকে ক্রিয়াত্মক রূপে আচরণ করিলে প্রাণায়ামের ক্রিয়ায় শীঘ্রই সফলতা লাভ করা যায়।

কোন কোনও সজ্জন বলিয়া থাকেন যে, প্রাণায়াম করিয়া তাহার এই কষ্ট হইয়াছে, ঐ কষ্ট হইয়াছে, অমুক রোগ হইয়াছে ইত্যাদি। বাস্তবিক পক্ষে এই সমস্ত ক্লেশ যাহাই হউক না কেন, উহা প্রাণায়ামের কারণে হয় নাই, কিন্তু উহা অভ্যাসীর অসাবধানতার জন্য হইয়া থাকিবে। যত সময় প্রাণায়াম অভ্যাসকারী

বিধি পূর্বক প্রাণায়াম অভ্যাস না করিবে, তত সময় উহা ফলদায়ক হইবে না। চিকিৎসা যেরূপ যথাযথ পথ্য ব্যতীত ফলদায়ক হয় না, সেইরূপ বিধিহীন প্রাণায়ামও ফলদায়ক হয় না।

যে সাধন দ্বারা প্রাণায়াম ফলদায়ক হয়, সেগুলি জানিয়া রাখা প্রয়োজন। কেননা, সেইগুলি প্রাণায়ামের পক্ষে ফলপ্রদ।

প্রাণায়ামের উপযোগী সাধন

১। **প্রথম সাধন**—প্রাণায়াম অভ্যাসীর মন, শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। মন শুদ্ধ করিবার পক্ষে, শুদ্ধ অন্ন সেবন করা প্রয়োজন। পরিশ্রম ও সৎপথে উপার্জিত ধনের অন্নই শুদ্ধ অন্ন। প্রবঞ্চনা ও কপটতা দ্বারা উপার্জিত অন্ন খাইয়া কেনও সাধক বা অভ্যাসী সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। কেননা,—এতাদৃশ অন্ন ভক্ষণে হৃদয় সদা মলিন থাকে। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রত— **যম**। শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান—**নিয়ম**।

২। **দ্বিতীয় সাধন**—প্রতিদিন যম ও নিয়মের চিন্তন ও অনুশীলন করা উচিত। স্বীয় কৃত কর্মের যে সমস্ত কর্ম অনুশীলনের প্রতিকূল, সেগুলি দ্বারা হৃদয়ে গ্লানি উৎপন্ন হইতে পারে। অতএব তদ্রূপ কর্ম পরিত্যাগ করিবার জন্য সর্বদা যত্নশীল থাকিতে হইবে।

৩। **তৃতীয় সাধন**—নাসিকা দ্বারা শ্বাস লইবার অভ্যাস, করা উচিত। কেহ কেহ মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে, এরূপ অভ্যাস হানিকর জানিবে।

৪। **চতুর্থ সাধন**—দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণের অভ্যাস করা উচিত।

৫। **পঞ্চম সাধন**—কোন ঋতুতেই মুখ ঢাকিয়া শয়ন করা উচিত নহে। শ্বাস দ্বারা শুদ্ধবায়ু ফুসফুস পর্যন্ত পৌঁছাইবার জন্য অন্ততঃ নাসিকা সদৈব খুলিয়া রাখা প্রয়োজন।

৬। ষষ্ঠ সাধন— যেখানে ধোঁয়া, ধূলি প্রভৃতি হানিকর পদার্থ না থাকে সেই রূপ শুদ্ধ এবং শান্ত স্থানে প্রাণায়াম অভ্যাস করা উচিত।

৭। সপ্তম সাধন—যাহাতে অজীর্ণ না হয় সে কারণ পেটের এক কোণ খালি রাখিয়া অর্থাৎ কিঞ্চিৎ ক্ষুধা রাখিয়া স্বল্প আহার করা উচিত।

৮। অষ্টম সাধন—রোগগ্রস্ত অবস্থায় প্রাণায়াম আরম্ভ করিবে না। উক্ত সাধনগুলির প্রতি লক্ষ্য থাকিলে এবং ইহাদের অনুকূলে চলিলে মানুষের হৃদয়ে প্রাণায়ামের দ্বারা সফলতা অর্জনের মনোভাব জাগ্রত হয়।[১] এই সমস্ত সাধনের কয়েকটির আবশ্যকীয় ব্যাখ্যা পুস্তকের শেষ অধ্যায়ে করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রাণায়ামের মূল সিদ্ধান্ত

মুনি পতঞ্জলি যোগদর্শনের যম, নিয়ম ও আসন সিদ্ধ হইলে প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবার বিধান দিয়াছেন। এই তিন প্রকার অঙ্গের অনুষ্ঠান দ্বারা একদিকে যেমন শারীরিক উন্নতি হয়, অপরদিকে যম, নিয়ম ও আসন দ্বারাও মানসিক উন্নতি হয়, এ বিষয়ে কাহারও মতভেদ নাই। কিন্তু আসনের অভ্যাস দ্বারা শারীরিক উন্নতি সাধন কিরূপে হয়, এ বিষয়ে কাহারও কাহারও মনে সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে। যোগদর্শনে কিন্তু স্পষ্টরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যে,

---

১। শেষ সাধন সকলের পক্ষে আবশ্যক, উহা শারীরিক উন্নতি লাভের আশায় হউক অথবা শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার উন্নতির আশায় হোক্।

আসন সিদ্ধ দ্বারা মানুষের দ্বন্দ্ব (শীত গ্রীষ্ম) সহ্য করিবার ক্ষমতা জন্মে।[১] এবার আসন সিদ্ধির পর প্রাণায়াম অভ্যাস আরম্ভ করা হইতেছে।

প্রাণায়ামের পরিচয়

শ্বাস ও **প্রশ্বাসের** গতিকে রুদ্ধ করার নাম **'প্রাণায়াম'**। নাসিকা দ্বারা বাহিরের বায়ুকে ভিতরে প্রবেশ করানকে **'শ্বাস'** এবং নাসিকা দ্বারা ভিতরের প্রবষ্টি বায়ুকে বাহিরে ফেলার নাম—**'প্রশ্বাস'**[২]।

ইহাদের গতি রুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্য,—শ্বাসকে ভিতরে প্রবেশ করাইয়া ভিতরেই রুদ্ধ করা। এইভাবে অভ্যন্তরস্থিত বায়ুকে বাহিরে ফেলিয়া বাহিরেই রুদ্ধ করিবে।

'প্রাণায়াম' শব্দ দুইটী শব্দের যোগে সৃষ্ট। 'প্রাণ+যাম', শ্বাস ও প্রশ্বাসের নাম প্রাণ, এবং ছড়ান বা বিস্তৃতি করিবার নাম 'যাম'। এই প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণকে বিস্তৃত করা Expanding of Breathing, এই কারণ প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের বিস্তৃতি অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাসকে নিগ্রহ করিয়া স্ববশে আনিয়া তাহাকে রুদ্ধ করিবার অবধিকে—সীমাকে বিস্তৃত করা।

প্রাণায়ামের প্রকার

প্রাণায়ামে তিনটি ক্রিয়া করা হয়। রেচক, পূরক, ও স্তম্ভবৃত্তি।

১। প্রাণকে বাহিরে বর্জন করা। ইহাকে 'রেচক' বলে।

১। ততোদ্বন্দ্বাহনভিঘাতঃ॥ (যোগদর্শন ২-৪৮) অর্থাৎ ঐ সমস্ত আসন সিদ্ধির দ্বারা দ্বন্দ্বের আঘাত লাগে না।

২। তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ (যোগ ২-৪৯) অর্থাৎ ঐ আসন সিদ্ধ হইলে শ্বাস ও প্রশ্বাসের গতিকে রুদ্ধ করিবার নাম প্রাণায়াম।

২। প্রাণকে ভিতরে গ্রহণ করা। ইহাকে 'পূরক' বলে।

৩। প্রাণ যেখানে আছে সেখানেই রুদ্ধ করাকে 'স্তম্ভবৃত্তি' বলে।

এই প্রাণায়াম—দেশ কাল ও সংখ্যা ভেদে তিন প্রকার।[১]

১। 'দেশ' পরিদৃষ্ট। স্বল্প দূর, অধিক দূর অথবা অত্যন্ত অধিক দূরের প্রাণ টানিয়া আনা বা পূর্ণ করা।

২। 'কাল' পরিদৃষ্ট। এক দুই অথবা অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রাণ সমূহকে বাহি ফেলা, ভিতরে টানিয়া আনা ও স্থির করা।

৩। 'সংখ্যা' পরিদৃষ্ট। এক দুই বা অধিক বার প্রাণ সমূহকে বাহিরে ফেল ভিতরে পূর্ণ করা এবং স্থির রাখা।

৪। প্রাণায়ামের চতুর্থ ক্রিয়া কুম্ভক।[২] এই কুম্ভকে এবং স্তম্ভবৃত্তি নাম প্রাণায়ামের পার্থক্য এই যে, স্তম্ভবৃত্তিকে প্রাণকে বাহিরে ও ভিতরে না ফেল এবং না-টানা অবস্থায় রুদ্ধ করা, কিন্তু কুম্ভক প্রাণকে বাহিরে ভিতরে টানি আনিয়া রুদ্ধ করা হয়।

ইহাই প্রাণায়ামের মূল সিদ্ধান্ত (মূল ক্রিয়া) এবং এই সমস্তের উপর ভি করিয়া প্রাণায়ামের অনেক বিভাগ করা হইয়াছে। উপযোগিতার দৃষ্টিতেএই সম বিভক্ত প্রাণায়াম সমূহকে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্থাপন করা হইয়াছে। ঋষিদের ই এক অপূর্ব প্রকাশ ভঙ্গিমার ফল এই যে, তিনটি সূত্রে প্রাণায়ামের সমস্ত ক্রি বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই বিদ্যার প্রচার না থাকায় দেশবা ও বিষয়ে এরূপ যোগ্যতাহীন হইয়া পড়িয়াছে, যে তাহারা সূত্রকে সামনে রাখি

১। সতু বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভি পরিদৃষ্টা দীর্ঘসূক্ষ্ম (যোগদর্শন ২।৫০। অর্থাৎ (১) বাহ্য, (২) আভ্যন্তর, (৩) স্তম্ভবৃত্তি ভেদে তিন প্রকারের প্রাণায়াম দেশ কাল ও সংখ্যা দ্বারা দৃষ্ট ও দীর্ঘ সূক্ষ্ম হয়।

২। ব্যহ্যাভ্যন্তরবিষযক্ষেপী চতুর্থঃ।। (যোগদর্শন ২। ৫১।। অর্থাৎ বাহ্য এব আভ্যন্তর=ভিতর, উভয় দেশে অপেক্ষাকারী চতুর্থ প্রাণায়াম অর্থাৎ যাহাকে এ দুই প্রাণায়ামের (রেচক, পুরক) পরিত্যক্ত হয় উহা চতুর্থ প্রাণায়াম।

অভ্যাস করিতেও অক্ষম। তাহা না হইলে এই সমস্ত পৃষ্ঠা লিখিয়া পূর্ণ করিবার প্রয়োজন কি?

ইহার পর বলা হইবে যে, কিভাবে একজন নবীন অভ্যাসীর প্রাণায়াম আরম্ভ করা প্রয়োজন। ইহার পূর্বে আর একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন যে, মানসিক উন্নতির দৃষ্টিতে প্রাণায়াম করা কেন প্রয়োজন?

প্রাণায়ামের ফল

প্রাণায়ামের ফল এই যে, উহার অভ্যাস দ্বারা হৃদয়ে সঞ্চিত তম আবরণ নষ্ট হইয়া যায়।[১] হৃদয়ে শুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চিত হয় এবং জ্ঞান সঞ্চিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু যখন মানুষ এরূপ কর্ম করিতে থাকে, যাহা কাম ক্রোধ ও মোহ দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং যাহাকে তমোগুণের পরিণাম বলা হয়, ঐ সমস্ত কর্মদ্বারা হৃদয়স্থিত শুদ্ধ জ্ঞানরূপী প্রকাশের আবরণ স্বরূপ হইয়া শুদ্ধ জ্ঞানকে ঢাকিয়া ফেলে। এই যে আবৃত জ্ঞান, ইহাকে কিভাবে 'তম আবরণ' হইতে মুক্ত করা যায়? ইহার একমাত্র উপায় প্রাণায়াম অভ্যাস। প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই অজ্ঞানতা বা 'তম আবরণ', জ্ঞানের প্রকাশ দ্বারা উত্তরোত্তর নাশ হইতে থাকে এবং জ্ঞানের প্রকাশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।[২] যেরূপ সুবর্ণাদি ধাতুকে দহন করিলে তাহাদের মল নষ্ট হয় তদ্রূপ তমোগুণ নাশ হইয়া শুদ্ধজ্ঞান প্রকাশ হইয়া পড়ে।[৩]

১। ততঃ ক্ষীযতে প্রকাশাবরণম্ ।। (যোগদর্শন ২। ৫২।।) অর্থাৎ উহা (প্রাণায়াম সাধন) দ্বারা প্রকাশের আবরণ ক্ষীণ হইয়া যায়।

২। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষযে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতৈঃ। (যোগ ২।২৮।।) অর্থাৎ অষ্টাঙ্গ যোগের অনুষ্ঠান দ্বারা অশুদ্ধি ক্ষয় এবং অশুদ্ধি ক্ষয়ে বিবেকখ্যাতি (তত্ত্বজ্ঞান) পর্যন্ত জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

৩। দহ্যন্তে ধ্মাযমানানাং ধাতুনাং হি যথা মলাঃ।
তথেন্দ্রিযাণাং দহ্যন্তে দোযাঃ প্রাণস্য নিগ্রহাৎ ।। মনু-৬। ৭১।।
অর্থাৎ সুবর্ণাদি ধাতুকে অগ্নিতে দহন করিলে যেরূপ তাহাদের মল নষ্ট হইয়া শুদ্ধ হয়, তদ্রূপ প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা ইন্দ্রিয় সমূহের দোষ দূর হয়।

প্রাণায়ামের আর একটি ফল

প্রাণায়ামের আর একটি ফল, ইহার অভ্যাস দ্বারা মানুষের ধারণার (চিত্তের একাগ্রতার) যোগ্যতা বৃদ্ধি পায়। চিত্তের একাগ্রতা জন্মিলে বিদ্যার্থী নিজের পাঠ অতি সহজে বুঝিতে ও মুখস্থ করতে পারে। ইহার অভ্যাস দ্বারা এক বৈজ্ঞানিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্বের পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এক দার্শনিক পরীক্ষার বিষয় বস্তুতে প্রবেশ করিয়া অধ্যাত্ম জগতে প্রগতি লাভ করিতে পারে। এক সাধারণ ব্যবসায়ী মানুষ আপন উদ্যমের গূঢ় অপেক্ষা গূঢ় বিষয়ে প্রবেশ করিয়া তাহার উপায় খুঁজিয়া বাহির করিতে পারে। মোট কথা ইহলোক ও পরলোক বিষয়ক ব্যাপার সবই চিত্তের একতা বা একাগ্রতা প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই লাভ করিতে পারে।

প্রাণায়ামের অনেক ফল এবং অনেক লাভ। কিন্তু ঐ সমস্তকে যদি মূল রূপে বলা যায় তাহা হইলে উহার বর্ণনা উপর্য্যুক্ত দুইটি ফলের রূপেই পাওয়া যাইবে। এবার আমরা প্রতিজ্ঞানুসারে উহার বিধি বর্ণনা করিতেছি, যাহাতে নবীন শিক্ষার্থী প্রাণায়াম অভ্যাসে আগ্রহশীল হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রথমেই বলা হইয়াছে যে, প্রাণায়াম অনেক প্রকারে, অনেক প্রকার কার্য্য সিদ্ধির জন্য করা হইয়া থাকে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই সমস্ত প্রাণায়ামের বিষয় বলিব যদ্দ্বারা সেই সমস্ত প্রাণায়ামের অভ্যাস করিবার রীতি সাধারণতঃ সকলের পক্ষেই উপযোগী হইবে।

সেরূপ প্রাণায়ামের কথাই বলা হইবে, যাহা যোগ সাধনের দৃষ্টিতে উচ্চ অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পরেও করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রাণায়াম

পদ্মাসন অথবা অপর কোনও আসন, যাহাতে সুখপূর্বক যত সময় প্রাণায়াম করিবার ইচ্ছা তত সময় আসন পরিবর্তন না করিয়া বসিয়া থাকা যায়।

১। বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক তিনটিকেই সরল ভাবে রাখিবে, এবং ধীরে ধীরে

নাসারন্ধ্র পথে প্রশ্বাস বাহিরে ফেলিবে (রেচক) এবং প্রশ্বাসকে বাহিরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। (বাহ্য কুম্ভক)।

২। যখন অধিক সময় পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ না করিয়া থাকা অসম্ভব মনে করিবে, তখন ধীরে ধীরে 'পুরক' শ্বাসকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। (অভ্যন্তর) কুম্ভক)।

৩। যখন অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরে রাখা সম্ভব হইতেছে না দেখিবে, তখন ধীরে ধীরে আবার 'রেচক' করিবে।

৪। এই ভাবে অনেকবার অভ্যাস করো, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত সাত মহা ব্যাহৃতি[১] মনে মনে জপ করিতে থাকো। জিহ্বার দ্বারা ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই।

ফুসফুসের সমস্ত কোষে বায়ু প্রবেশ করান দ্বিতীয় প্রাণায়াম

১। শান্ত হইয়া পদ্মাসন অথবা অপর কোরও আসনে, যাহাতে সুখ পূর্বক শেষ পর্যন্ত বসা যায়—বসিবে, এবং নাসিকা হইতে ধীরে ধীরে শ্বাস দ্বারা শুদ্ধ বায়ু ভিতরের দিকে টানিতে থাকিবে। প্রথমে ফুসফুসের নীচের দিক পুণ

এই প্রাণায়াম দ্বারা রেচক পূরক ও কুম্ভক অর্থাৎ মানুষের মধ্যে প্রাণায়াম, এবং উহা প্রত্যেকটি ক্রিয়া করিবার অভ্যাস হয় তথা ভবিষ্যতে প্রাণায়াম করিবার শক্তি জাগিয়া উঠে। এই প্রাণারামের অভ্যাস সেই পরিমাণ করা উচিত, যাহাতে শ্বাসকে ভিতরে দুই মিনিট কাল ধরিয়া রাখিতে পারা যায়। অধিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলে অধিক লাভ। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, যত সময় শ্বাসকে ভিতরে অক্লেশে রাখা যায় তত সময় রাখিবে ; চিত্তকে পরাধীন করিবেন না। অভ্যাস দ্বারাই ধীরে ধীরে বাহির ভিতর উভয় দিকে শ্বাসরুদ্ধ করিবার শক্তি আপনা—আপনি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

১। মহাব্যাহৃতি ওম্ ভূঃ। ওম্ ভুবঃ। ওম্ স্বঃ। ওম্ মহঃ। ওম্ জনঃ। ওম্ তপঃ। ওম্ সত্যম্।

...রন্ধ্র পথে প্রশ্বাস বাহিরে ফেলিবে (রেচক) এবং প্রশ্বাসকে বাহিরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। (বাহ্য কুম্ভক)।

২। যখন অধিক সময় পর্যন্ত শ্বাস গ্রহণ না করিয়া থাকা অসম্ভব মনে করিবে, তখন ধীরে ধীরে 'পুরক' শ্বাসকে ভিতরে গ্রহণ করিয়া অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরেই রুদ্ধ করিয়া রাখিবে। (অভ্যন্তর) কুম্ভক)।

৩। যখন অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে ভিতরে রাখা সম্ভব হইতেছে না দেখিবে, তখন ধীরে ধীরে আবার 'রেচক' করিবে।

৪। এই ভাবে অনেকবার অভ্যাস করো, এবং প্রত্যেক ক্রিয়ার সহিত সাত মহা ব্যাহৃতি[১] মনে মনে জপ করিতে থাকো। জিহ্বার দ্বারা ব্যাহৃতি উচ্চারণ করিবার প্রয়োজন নাই।

ফুসফুসের সমস্ত কোষে বায়ু প্রবেশ করান দ্বিতীয় প্রাণায়াম

১। শান্ত হইয়া পদ্মাসন অথবা অপর কোনও আসনে, যাহাতে সুখ পূর্বক শেষ পর্যন্ত বসা যায়—বসিবে, এবং নাসিকা হইতে ধীরে ধীরে শ্বাস দ্বারা শুদ্ধ বায়ু ভিতরের দিকে টানিতে থাকিবে। প্রথমে ফুসফুসের নীচের দিক পুণ

এই প্রাণায়াম দ্বারা রেচক পূরক ও কুম্ভক অর্থাৎ মানুষের মধ্যে প্রাণায়াম, এবং উহা প্রত্যেকটি ক্রিয়া করিবার অভ্যাস হয় তথা ভবিষ্যতে প্রাণায়াম করিবার শক্তি জাগিয়া উঠে। এই প্রাণায়ামের অভ্যাস সেই পরিমাণ করা উচিত, যাহাতে শ্বাসকে ভিতরে দুই মিনিট কাল ধরিয়া রাখিতে পারা যায়। অধিক সামর্থ্য বৃদ্ধি করিতে পারিলে অধিক লাভ। কিন্তু একটি কথা মনে রাখা উচিত যে, যত সময় শ্বাসকে ভিতরে অক্লেশে রাখা যায় তত সময় রাখিবে ; চিত্তকে পরাধীন করিবেন না। অভ্যাস দ্বারাই ধীরে ধীরে বাহির ভিতর উভয় দিকে শ্বাসরুদ্ধ করিবার শক্তি আপনা—আপনি বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

১। মহাব্যাহৃতি ওম্ ভূঃ। ওম্ ভুবঃ। ওম্ স্বঃ। ওম্ মহঃ। ওম্ জনঃ। ওম্ তপঃ। ওম্ সত্যম্।

করো এবং প্রবল ইচ্ছা রাখো যে, ফুসফুসের নীচের দিক বায়ু দ্বারা ভর্তি হইতেছে। এরূপ করিলে পেট কিছুটা ফুলিয়া যাইবে।

ইহার পর সেই শ্বাস দ্বারাই ফুসফুসের মধ্যভাগে বায়ু পৌঁছাইয়া দাও। এই ক্রিয়া এবং পূর্বের ক্রিয়ার সহিত ইচ্ছা শক্তিকে যুক্ত করিতে থাকো। এই ক্রিয়ার দ্বারা পেটে একটু সংকোচন হইয়া যাইবে (চুপসিয়া যাইবে) এবং বক্ষের উপরিভাগ কিছুটা উন্নত হইয়া ভরিয়া উঠিবে।

ইহার পর শ্বাসের তৃতীয় ও অন্তিম ভাগ হইতে ফুসফুসের উপর অংশ ভরিয়া তোলো। এই ক্রিয়া প্রারম্ভ করিবার পূর্বে দুই স্কন্ধকে একটু উপরে উঠাও। এই তিনটি ক্রিয়ার দ্বারা পূর্ণ করা হইল। ইহাকে সম্পূর্ণ করিতে মোটামুটি অর্দ্ধ মিনিট ব্যয় করিতে হইবে।

২। ইহার পর কুম্ভক করিবে। এক মিনিট অপেক্ষা কিছু অধিক অথবা কমপক্ষে এক মিনিট বায়ুকে ভিতরে রুদ্ধ করিয়া রাখিবে।

অভ্যাস করিবার সময় কতগুলি প্রাণায়াম এক সঙ্গে করিতে হইবে পরন্তু নিরন্তর বিরাম না দিয়া করিবে না। এক প্রাণায়ামের পর দুই, চার বার শ্বাস গ্রহণ করিয়া আবার দ্বিতীয় প্রাণায়াম। এইভাবে তৃতীয়, চতুর্থ প্রভৃতি করিতে থাকিবে।

ইহার সহিত এই ইচ্ছা মনে করিতে থাকিবে ফুসফুসের সমস্ত কোষ যেন বায়ু দ্বারা পূর্ণ হইতেছে।

২।পুনরায় 'রেচক' করিয়া বায়ুকে বাহিরে নিক্ষেপ করো।

তৃতীয় সুখদ প্রাণায়াম

প্রাণায়াম অভ্যাস কালে ক্লান্তি হয়। ক্লান্তি দূর করিবার জন্য সুখদ প্রাণায়াম করা প্রয়োজন। এই জন্য ইহার নাম সুখদ প্রাণায়াম।[১]

১। কোনও প্রকার বা যে কোন প্রকারের প্রাণায়াম অভ্যাস কর না কেন, শেষে 'সুখদ' প্রাণায়াম অবশ্যই করিবে। ইহার দ্বারা সুস্থাভাব ফিরিয়া আসে এবং সর্বপ্রকার শ্রান্তি দূর হয়।

১। প্রাণায়ামের সংখ্যা অনুসারে পূর্ণ করিবে।

২। সঙ্গে সঙ্গে ইচ্ছা শক্তিকে যুক্ত করিয়া ‘কুম্ভক’ করিবে।

৩। ‘রেচক’ মুখের সাহায্যে করিবে। মুখের সাহায্যে ‘রেচক’ করিবার সময় মুখের স্থিতি এবং আকৃতি এরূপ করিবে যেরূপ মুখ দিয়া সিটি বাজাইবার সময় হইয়া থাকে এবং বেগে তিন অপেক্ষা অধিক বার বাহিরে স্বল্প স্বল্প শ্বাস বাহিরে ফেলিবে। একবার ফেলিবার পর কিছু সময় থামিয়া, ঐভাবে পুনরায় ফেলিবে এবং ফেলিবার পর কিছু সময় থামিয়া প্রত্যেকবার বলপূর্বক বাহিরে শ্বাস ফেলিবে।

ফুসফুস ব্যতীত পেট এবং অন্ত্রেও বায়ু পূর্ণ করা

চতুর্থ প্রাণায়াম

১। বাম পা দক্ষিণ জঙঘার উপর স্থাপন করো। গ্রীবাও পৃষ্ঠ দেশকে সোজা সমান ভাবে রাখো। দুই হাতের করতল হাঁটুর উপর রাখিয়া মুখ বন্ধ করিয়া বোস।

২। নাসিকার দুই ছিদ্র হইতে ধীরে ধীরে অথচ শীঘ্র ‘পূরক’ করো এবং কুম্ভক’ ছাড়াই ‘রেচক’ করো।

মন্তবা ১—এ কথা মনে রাখতে হইবে যে, যত সময় না ভুক্ত দ্রব্যের প্রতিটি কণা (Qxygen) অক্সিজেনের ভিতরে প্রবেশ করে, তত সময় ভোজন পরিপাক হয় না। এইজন্য আমাশায় এবং অন্ত্রেও প্রচুর মাত্রায় বায়ু থাকা উচিত।

মন্তব্য ২—এই প্রাণায়ামের অভ্যাস হইয়া গেলে ইহার অনুষ্ঠানে সাধারণ জ্বর দূর করা যায়। আর যদি সময়ে ভোজন না পাওয়া যায়, তাহা হইলে এই প্রাণায়াম অভুক্ত অবস্থায় করিলেও কিছু সময় মানুষ ক্ষুধায় কষ্ট হইতে রক্ষা পাইতে পারে।

৩। এই অভ্যাস নিরন্তর করিয়া যাও, যত সময় না পরিশ্রান্ত হও এবং ঘাম না ঝরে তত সময় করিয়া যাও।

৪। অভ্যাস কালে দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে স্থির রাখিবে।

৫। পরিশ্রান্ত হইলে দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পূরক' করিয়া 'কুম্ভক' করিবে এবং ফুসফুসকে বায়ু দ্বারা খুব পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিবে ইহার পর, বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করিয়া অভ্যাস শেষ করিবে।

সমস্ত শরীরকে সুস্থ রাখিতে
পঞ্চম প্রাণায়াম

১। বাম জঙ্ঘার উপর দক্ষিণ পা এবং দক্ষিণ জঙ্ঘার উপর বাম পা রাখো দক্ষিণ হস্ত দ্বারা পিছন দিক্ হইতে ডান পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং এই ভাবে বা হাত দ্বারা বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরিবে। যদি দেহ নমনশীল ও হাল্কা না হয় তাহা হইলে অঙ্গুষ্ঠকে হস্ত দ্বারা ধরিতে পারা সম্ভব নাও হইতে পারে এমতাবস্থায় ঐ অঙ্গুষ্ঠদ্বয়কে ধরিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে করিতে শরীরকে খুব শক্ত করিয়া ও সরল বা ঋজু অবস্থায় রাখিবে।

২। প্রাণায়াম,—সংখ্যা (১) এর ন্যায় 'পূরক' 'কুম্ভক' ও 'রেচক' করো

৩। যত সময় না দেহে রোমাঞ্চ হইতেছে মনে হয়, তত সময় অভ্যাস করিতে থাকো।

শক্তিলাভ করিবার ও শক্তিস্থির রাখিবার জন্য
ষষ্ঠ প্রাণায়াম

১। পদ্মাসনে উপবেশন করো।

২। দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পূরক' করো।

৩। নিজের চিবুককে বুকের উপর রাখিয়া, সরল হস্ত দ্বারা বা পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং বাম হস্ত দ্বারা দক্ষিণ পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো, এব মাথাটিকে দক্ষিণ অথবা বাম যে কোনও হাঁটুর সহিত ঠেকাইয়া 'কুম্ভক' করো

৪। বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। দ্বিতীয় প্রাণায়ামের সময় বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পূরক' এবং দক্ষিণ নাসাবন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করা উচিত।

৬। এই অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া এক ঘন্টা কাল পর্য্যন্ত করা উচিত।

সপ্তম প্রাণায়াম

রক্ত সঞ্চারক ক্রিয়াকে নিয়মিত করিতে এবং বিচার শক্তির বৃদ্ধির জন্য নিম্ন প্রকার প্রাণঅয়াম।

১। পদ্মাসনে উপবেশন করো। দক্ষিণ হাত দ্বারা দক্ষিণ পায়ের এবং বাম হাত দ্বারা বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো।

২। বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পূরক' করো।

৩। আবার 'কুম্ভক' করো।

৪। পুনরায় দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা 'পূরক' এবং বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা ধীরে 'রেচক' করো। বাম নাসারন্ধ্র দিয়া 'রেচক' করা উচিত। এইভাবে পূর্ব অভ্যাস মত প্রত্যেক প্রাণায়ামের সহিত 'রেচক' ও 'পূরক' প্রাণায়ামের ক্রম পরিবর্তন করিতে থাকিবে।

৫। দাম বাহির হইতে থাকিলে এই অভ্যাস স্থক্ষিণ রাখা উচিত।

১। বাম পায়ের গোড়ালি মুলেন্দ্রিয়ে এবং দক্ষিণ পায়ের গোড়ালি বাম পায়ের জঙ্ঘায় রাখো এবং চিবুককে বুকে লাগাইয়া চোখ বন্ধ রাখো।

২। গভীর এবং দীর্ঘ শ্বাস লইয়া 'রেচক' করো।

৩। পুনরায়—'কুম্ভক' এবং তার পর 'রেচক' করো।

৪। এই অভ্যাস বৃদ্ধি করিতে এক ঘন্টা পর্যন্ত সময় নিযুক্ত করা আবশ্যক।

শীত ত্রাণার্থ

নবম প্রাণায়াম

১। বাম পদ মূলেন্দ্রিয়ের নীচে রাখো এবং চিবুককে বুকে। হাত দুইটিকে

প্রসারিত করিয়া লম্বমান সরলভাবে স্থিত দক্ষিণ পদকে ধরো, এবং মাথাটিকে দক্ষিশ হাঁটুর সহিত লাগাইয়া দাও।

২। বাম নাসারন্ধ্র দ্বারা প্রাণায়াম সংখ্যা ২ এর ন্যায় 'পূরক' করিয়া ফুসফুসকে বায়ু দ্বারা পুর্ণ করিয়া দাও।

৩। দৃষ্টিকে নাসিকার অগ্রভাগে স্থির করিয়া 'কুম্ভক' করো।

৪। পুনরায় দক্ষিণ নাসারন্ধ্র দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। কে ঘন্টাকাল এইরূপ অভ্যাস করিলে ঘাম ঝরিতে থাকিবে এবং রক্তের গতি ও বৃদ্ধি পাইবে। ঘাম ঝরিতে থাকিলে অভ্যাস বন্ধ করা উচিত।

আমাশয়ের (সাধারণ) রোগ নিবৃত্তির জন্য

দশম প্রাণায়াম

১। যুক্ত-জানু হইয়া উপবেশন করো, করতল বিস্তৃত করিয়া জঙঘার উপর স্থাপন করো অথবা অনুরূপ করতল পৃষ্ঠদেশে রাখো।

২। প্রথম 'পূরক' তাহার পর 'কুম্ভক', তাহার পর 'রেচক' করো।

৩। এই অভ্যাস ক্রমশঃ বৃদ্ধি করিয়া একঘন্টা পর্যন্ত চালাও।

দন্তরোগ দূরীকরণার্থে এবং শারীরিক পুষ্টির জন্য

একাদশ প্রাণায়াম

১। বাম পা দক্ষিণ জঙ্ঘার এবং দক্ষিণ পা বাম জঙ্ঘায় স্থাপন করো এবং দক্ষিণ হাত দিয়া দক্ষিণা পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে এবং বাম হাত দিয়া বাম পায়ের অঙ্গুষ্ঠকে ধরো।

২। মুখ দিয়া এভাবে পূরক করিবে যেন, দন্ত পংক্তি ও শ্বাস গ্রহণে সহায়ক হয় এবং 'সী', শব্দের ন্যায় ধ্বনি হইতে থাকে।

৩। 'কুম্ভক' করিয়া নাসারন্ধ্র পথে ধীরে ধীরে 'রেচক' করিবে।

৪। এইভারে ৪৫ মিনিট পর্যন্ত অভ্যাস বৃদ্ধি করা উচিত।

শরীরের উষ্ণতার মাত্রা বৃদ্ধির জন্য দ্বাদশ প্রাণায়াম

১। সিদ্ধাসন হইয়া বসিবে। দুই নাসারন্ধ্র পথে প্রথমে ধীরে ধীরে 'পূরক' করিয়া পরে 'চেরক' করিবে।

২। পুনরায় 'পূরক', পূর্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ দ্রুত করিয়া আবার 'রেচক'।

৩। এইভাবে পূরকের বেগ ধীরে ধীরে দ্রুতবৃদ্ধি করিতে থাকিবে যাহাতে শ্বাস লৌহকারের হাপরের ন্যায় চলিতে থাকে।

৪। ঘাম দেখা দিলে অভ্যাস স্থগিত রাখিবে।

দ্রষ্টব্য ঃ—এই প্রাণায়ামের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা শরীরের গাঁয়ের বেদনা এবং পায়ের পেটের বেদনা দূর হইতে থাকে, পরন্তু অভ্যাস ধীরে ধীরে একঘন্ট কাল বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

ত্রয়োদশ প্রাণায়াম

জিহ্বা, তালু, নাসিকা, কর্ণ এবং গলা, কণ্ঠ ও গ্রীবাকে নীরেগ রাখিতে হইলে—

১। শান্ত চিত্তে পদ্মাসনে বসিবে।

২। জিহ্বার অগ্রভাগ তালুর সহিত স্পর্শ করাও। তাহার পর সাহায্যে মুখ দ্বারা 'পূরক' করো।

৩। সমস্ত শরীরকে শিথিল করিয়া 'কুম্ভক' করো।

৪। নাসিকা দ্বারা 'রেচক' করো।

৫। অভ্যাস দ্বারা এই প্রক্রিয়া ৪৫ মিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করো।

ব্রহ্মচর্য্যের সাধক দতুর্দশ প্রাণায়াম

১। চিৎ হইয়া শয়ন করো, কান দুটিকে তুলার নুটি অথবা মোম দিয়া প্রসারিত

বন্ধ করিয়া দাও, যাহাতে কোনও প্রকার শব্দ শুনতে না পাওয়া যায়। এবার নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থাপন করো।

২। অর্ধঘন্টাকাল এই অবস্থায় থাকিবে। থামিয়া দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করিতে থাকো।

৩। এবার চোখের পুতলি দুটিকে উপরে উঠাও এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করো। এইরূপ করিলে চক্ষু দুইটি বন্ধ হইতে থাকিবে, উহাকে বন্ধ থাকিতে দাও।

দ্রষ্টব্য ঃ—(১) এই ক্রিয়ার অভ্যাস দ্বারা 'কুম্ভক' করিবার শক্তি বৃদ্ধি পায়। চিত্তে একাগ্রতা জন্মে এবং ইন্দ্রিহ হয়।

(২) উক্ত ২ এর সংখ্যার স্থিতিতে অধিক সময় থাকিলে ভিতরে শব্দ শোনা যায়। যাহাকে কবীর প্রভৃতি মহাপুরুষগণ 'অনহদ' নাদ বা শব্দ আখ্যা দিয়াছেন।

বীর্যস্তম্ভক

পঞ্চদশ প্রাণয়াম

১। বাম পদের গোড়ালীটিকে মলেন্দ্রিয়ের নীচে এবং দক্ষিণ পা খানি বাম পায়ের জঙ্ঘার উপর স্থাপন করো।

২। নাভি দেশে ধারণ করিয়া নাসিকার যে কোনও ছিদ্র পথে 'পূরক' করো।

৩। পুনরায় 'কুম্ভক' করিয়া অপর ছিদরে পথে 'রেচক' করো।

৪। এই ভাবে চতুর্দশ বার অভ্যাস করো।

৫। ইহা স্মরণ রাখা উচিত যে, যে ছিদ্র পথে 'পূরক' ও 'চেরক' করা হইয়াছিল এক সময়ের অভ্যাস, ঠিক সেই সেই ছিদ্র পথে 'পূরক' ও 'রেচক' করা উচিত।

দ্রষ্টব্য ঃ—(১) প্রাণায়াম আরম্ভকালে সব প্রথম 'যম' ও 'নিয়ম'

ভালোভাবে বুঝিয়া চিন্তন করিতে থাকিবে, যেন বীর্য্যের উর্ধ্ব গতি লাভ হইতেছে।

(২) প্রাণায়ামের প্রত্যেকটি ক্রিয়া সাধিবার সময় মনে এরূপ প্রবল ভাব জাগ্রত করিতে থাকিবে, যেন বীর্যের উর্ধ্বগতি লাভ হইতেছে।

(৩) গৃহস্থ পুরু?ের পক্ষে স্ত্রীর গর্ভস্থিতি হইলে এই প্রাণায়াম অভ্যাস দ্বারা লাভবান হইতে পারা যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাণায়ামের উপযোগী সাধনের স্পষ্টীকরণ

বিষয় শেষ করিবার পূর্বে প্রথমে ইহা বলা প্রয়োজন যে, প্রাণায়ামের আটটি উপযোগী সাধনের মধ্যে যাহা প্রথম অভ্যাসের শেষে লিখিত হইয়াছে তাহার স্পষ্টীকরণ এরূপভাবে করা উচিত যাহাতে উহাদের উপযোগিতা পাঠকবর্গের হৃদয়ঙ্গম হয়।

তৃতীয় সাধনের স্পষ্টীকরণ

তৃতীয় সাধনটি এই যে, নাসিকা দ্বারা শ্বাস লইবার অব্যাস করা উচিত। কেননা, নাসিকা পথে শ্বাস লইবার ব্যবস্থা, প্রকৃতি জাত নাসিকা শ্বাস লইবার যন্ত্র, মুখ শ্বাস লইবার যন্ত্র নহে। যে যে ইন্দ্রিয় যে যে কর্মের জন্য নিযুক্ত সেই সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা সেই সেই কর্ম যথারীতি সম্পন্ন করা উচিত। ইহাই ঈশ্বরীয় নিয়ম। এবার জানা উচিত যে, নাসিকা দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা কেন রাখা হইয়াছে?

১। **প্রথমতঃ**—মোটাটুটি কথা এই যে, নাসিকা তাহার অনুযোগী বস্তু ভিতরে প্রবেশ করিতে দেয় না।

২। **দ্বিতীয়তা**—যদি কোনও অনুপযোগী কণা নাসিকার লোমা উল্লঙ্ঘন করিয়া ভিতরে প্রবেশ ফেলে, তাহা হইলে নাসিকা সে বস্তুটিকে হাঁচিনা বাহির করিয়া দেয়।

৩। **তৃতীয়ঃ**—ফুসফুসের কোষগুলি অত্যন্ত কোমল বলিয়া যে বায়ুটি সেখানে পৌঁছিবে তাহার শীকেষ্ণতা Temparecture এরূপ হওয়া উচিত, যাহাতে সে উহা সহ্য করিতে পারে। এই কারণ নাসিকার এরূপ ব্যবস্থা আছে। বায়ু শ্বাস দ্বারা যখন ভিতরে প্রবেশ করে, তখন নাকের ভিতরে ঝিল্লির (Macus membrance) সম্পর্কে সে গ্রহণের অনুকূল শীতোষ্ণ (Temperature) হইয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হয়, এইভাবে ফুসফুসের কোমল কোশ সমূহের কোনও প্রকার ক্ষতি হয় না। কিন্তু মুখে এ সমস্ত ব্যবস্থা নাই। এই কারণ নাসিকা পথেই শ্বাস করা উচিত।

পঞ্চম সাদনের স্পষ্টীকরণ

পঞ্চম সাধন এই যে, নিদ্রা কালেও মুখ না ঢাকিয়া নিদ্রা যাওয়া উচিত। মুখ ঢাকিয়া নিদ্রা যাইবার কদ্-অভ্যাস দ্বারা শ্বাসের সহিত সেই দুর্গন্ধযুক্ত বায়ু, প্রশ্বাস দ্বারা বিষ্যক্ত হইয়া যে বায়ু বাহির হইয়াছিল উহা পুনরায় ভিতরে প্রবেশ করে এবং এইভাবে বারংবার যাওয়া আসা করে। পরিণাম স্বরূপ এই অশুদ্ধ বায়ু দ্বারা রক্ত পরিষ্কার না হইয়া বিষাক্তই থাকিয়া যায়। অতএব সুস্থ ও নীরোগ থাকিতে হইলে কি স্ত্রী, আর কি পুরুষ বা বালক ও বালিকা সকলেরই মুখ না ঢাকিয়া নিদ্রা যাওয়ার অভ্যাস করা উচিত।

সপ্তম সাধনের স্পষ্টীকরণ

সপ্তম সাধন ভোজন। ভোজন ততটুক করা প্রয়োজন যতটুকু ভোজন করিলে অজীর্ণ বা অম্ল হয়। অত্যধিক ভোজন বজনীয়। প্রায় দেখা যায়, ভোজন বিষয়ে মানুষ বড়ই অসংযমী ও অসাবধান। পরিণাম স্বরূপ দেশবাসীর স্বাস্থ্যহানি ঘটে, স্বল্পায়ুও হয়। ভোজনের সংশোধন ও প্রয়োজন। সে সম্বন্ধে কিছু নিয়ম পালন করা প্রত্যেকের অবশ্য কর্তব্য।

১। ভোজন যথ্য সময় অর্থাৎ নিশ্চিত সময়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রয়োজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অল্প পরিমাণে ভোজন করিবে।

২। ভোজন করিবার পর তিন ঘন্টার মধ্যে স্বল্প মাত্রাও আহার করা উচিত নহে।

৩। প্রসন্ন হইয়া ভোজন করিবে, অপ্রসন্ন হইয়া ভোজন করিবে না। কেহ কেহ অন্নের নিন্দা করিয়া থাকে এবং ভোজ্যের ত্রুটি বিচ্যুতি বাহির করে। শুধু তাহাই নহে, অনেকে অপ্রসন্ন হইয়াও ভোজন করে। এরূপ ভোজনকারীর ভুক্ত অন্ন পরিপাক হয় না।

৪। খাদ্য খুব চিবাইয়া চিবাইয়া খাইবে। দুই প্রকার প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছেন। (১) এক প্রকার প্রাণী যাহাদের দাঁত আছে, (২) আর এক প্রকার যাহাদের দাঁত নাই। যথা—পক্ষী। ইহাদের পেটে এক প্রকারের 'পাথরী' (Cizzard) দেওয়া আছে, যাহার সাহায্যে তাহারা দাঁতের ন্যায় ভোজনকে পেষণ করিতে পারে।

মানুষের দাঁত আছে, উহা তাহাদের 'আমাশয়ে' উপযুক্ত। পাথর দেওয়া হয় নাই। এই কারণ, মানুষকে দাঁতের সাহায্যে ভোজ্য বস্তু খুব চিবাইয়া চিবাইয়া খাওয়া উচিত। যাহাতে ভুক্ত দ্রব্য এরূপ সূক্ষ্ম হইয়া যায়, যেন মুখ হইতে নিগত লালা Saliva ভালভাবে চবিত খাদ্যে মিশ্রিত হইয়া যায়।

মুখের ভিতরে ছয়টি গ্রন্থি আছে। (Salivary Glands) তাহাদের চারটি, জিহ্বা ও মাড়ির নীচে ; আর দুইটি আছে গলার দুই দিকে। মানুষ যখন আহার করে, তখন ঐ গ্রন্থি সমূহ হইতে ক্লোমরস নিঃসরণ হইতে থাকে এবং ঐ লালা বা ক্লোমরস খাদ্য দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইতে থাকে। খাদ্য দ্রবাকে চিবাইয়া যত সূক্ষ্ম করা হইবে নিসৃত ক্লোমরস ততই চর্বিত খাদ্যের সহিত মিশিয়া যাইবে। ইহাতে পরিপাক ক্রিয়া সহজ হইবে।

যে ব্যক্তি খাধ্য বস্তুকে দাঁত দিয়া অধিক না চিবাইয়া অর্ধ-চর্বিত অবস্থায় গিলিয়া খায়, তাহাদের অর্ধ-চর্বিত খাদ্যে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ক্লোমরস মিশ্রিত না হওয়ায় পরিপাক ক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে।

সুতরাং ভোজন বিষয়ে প্রথম কাজ হইবে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য দ্রবাকে চিবাইয়া তাহাকে মিষ্ট রসে পরিণত করা। ইহা গ্রন্থি হইতে নিঃসৃত রস দ্বারাই

হইতে পারে। যত সময় পর্যন্ত আমাশয়ে চর্বিত খাদ্য না পৌঁছয়, তত সময় চর্বণ ক্রিয়াকে সক্রিয় রাখা প্রয়োজন।

যখন চর্বিত খাদ্য দ্রব্য আমাশয়ে মিষ্ট রূরে পরিবর্তিত হইয়া পৌঁছয় তখন হইতেই আমাশয়ের সূক্ষ্ম নালি হইতে (Gastric jnice) পাচক রস নির্গতি হইয়া মিশ্রিত হয় এবং এই পাচক রসে আরও একটি সূক্ষ্ম পরিপাচক দ্রব্য থাকে তাহার নাম (Pepsin)। এই (Pepsin juice) রস এবং পাচা দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হইলেই ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হয়। পরন্তু এই পাচক রস ও পাচা দ্রব্য, ভুক্ত পদার্থের সহিত তখনই মিশ্রিত হয়, যখন ভোজন শর্করায় পরিবর্তিত হইয়া যায়। যদি ভোজা শর্করায় পরিবতিত না হইয়া ভুক্ত দ্রব্য আমাশয়ে পৌঁছিয় তখন উহা পরিপাকের পরিবর্তে পচন আরম্ভ করে এবং সেই পচা ভুক্ত ভোজন ধীরে ধীরে অস্ত্রে প্রবেশ করে এবং উহাতে এরূপ দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে যে, পচা গলা বস্তুতে সৃষ্ট পোকার ন্যায় অন্ত্রেও ক্রিমি সৃষ্টি হইয়া মানুষকেরোগী করিয় তোলে।

আপরদিকে আমাশয়ে পচা ভুক্ত ভোজনের অবশিষ্ট অংশ থাকিয়া যায় এবং তাহার ক্রমাগত ভোজনের সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহকে বিষ্যক্ত করিয়া তোলো। এইরূপে স্থায়ী অজীর্ণতা সৃষ্টি হয় এবং সমস্ত শরীরকে বিষ্যক্ত ভোজন জনিত দোষে দেহের রক্তে নানাপ্রকার রোগ উৎপন্ন করে। এই সমস্ত ভয়ানক পরিণাম কেবল খাদ্যকে ভালোভাবে চিবাইয়া না খাইবার জন্যই হইয়া থাকে। শুধু তাহাই নহে, ভুক্ত দ্রব্যকে লালা দ্বারা মিশ্রিত করিয়া না খাইবার দুষ্পরিণাম ভোগ করিতে হয়। অতএব ভোজন খুব চিবাইয়া অবশ্যই করা উচিত।

ভবিয়া দেখুন, যেখন ভোজনের দুষ্পরিণামে শরীর এরূপ রোগগ্রস্ত হইয়া যায়, সে অবস্থায় বিষাক্ত রক্ত শরীরে রাখিয়া শরীরকে রোগী করিয়া প্রাণায়াম করিবার প্রয়াস নিরর্থক নহে কি?

অতএব প্রাণায়ামের উপযোগী যে সমস্ত সাধন বলা হইয়াছে, সেগুলিকে যথাযথ রূপে কার্য্যোপযোগী করা আবশ্যক। যাঁহারা প্রাণায়াম করেন এবং যাঁহারা করেন না তাঁদের সকলের বর্ণিত নিয়ম পালন করা কর্ত্তব্য।

প্রাণায়াম

বিষয় বিকার হইতে উৎপন্ন মলিনতা পরিমার্জনার্থে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সমূহ এবং অন্তঃকরণে আবৃত বিষয় ধূলিকে ঝাড়িয়া পুঁছিয়া পবিত্র করিবার জন্য প্রাণায়াম এক সার্থক মার্জন সাধনা। দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং মনের মলিনতা, বিক্ষেণ তথা আবরণকে নষ্ট করিবার জন্য মুনস্মৃতি, তথা যোগ দর্শন প্রভৃতি সংশাস্ত্রকারগণ প্রাণায়ামকে প্রমুখ সাধন স্বীকার করিয়াছেন। বিধিবৎ প্রাণায়ামের অভ্যাস দ্বারাই মানুষ মল রহিত হয় এবং দিব্য ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারাই বিশুদ্ধ জ্ঞানলাভ করে।

—ঃ সম্পূর্ণ ঃ—

ভেক ও প্রাণায়াম

কতিপয় প্রাণীর নাম উল্লেখ করা যাইতেছে যাহার এক মিনিটে নিম্ন প্রকার সংখ্যায় শ্বাস গ্রহণ করে।

কপোত—৩৪। সাধারণ পক্ষী—৩০। হংস—২১। বানর—৩০। মনুষ্য—১২। বরাহ—৩৬। কুক্কুর—২৮। মার্জারি—২৪। অজ—২৪। অশ্ব—১৬। ভেক—৩।

এই হিসাবে দেখা যায় যে, ভেক সর্বাপেক্ষা অল্প শ্বাস গ্রহণ করে। ভেক সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞগণ বলেন—ভেত ১১০ বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ইহারা ভূমির নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং পাঁচ মাস পর এপ্রিলের মধ্যভাগে বর্ষায়, আবার আত্মপ্রকাশ করে। এই পাঁচ ইন্দ্রারা অনাহারে এবং শ্বাস গ্রহণ না করিয়া বাঁচিয়া থাকে।

আর্য্য সমাজের দশ নিয়ম

১—সব সত্যবিদ্যা এবং যে পদার্থ বিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদি মূল পরমেশ্বর।

২—ঈশ্বর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। নিরাকার শক্তিমান, ন্যায়কারী, দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি, অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টিকর্ত্তা। তাঁহারই উপাসনা করিবে।

৩—বেদ সব সত্যবিদ্যার পুস্তক। বেদের পঠন, পাঠন, শ্রবণ ও শ্রাবণ সব আর্য্যের পরম ধর্ম।

৪—সত্য গ্রহণে ও অসত্য পদত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে।

৫—সব কার্য কর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য ও অসত্যের বিচারপূর্বক করিবে।

৬—সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করিবে।

৭—সকলের সহিত প্রীতিপূর্বক ধর্মানুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে।

৮—অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করিবে।

৯—প্রত্যেকে নিজের উন্নতিতে সন্তুষ্ট থাকিবে না, কিন্তু সকলের উন্নতিতে নিজের উন্নতি জানিবে।

১০—সব মনুষ্য সামাজিক সর্বহিতকর নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকিবে এবং প্রত্যেক হিতকর নিয়মে স্বতন্ত্র থাকিবে।